

আবু বকর সিদ্দীক

"দেহে ক্ষীণকায়, কিন্তু প্রভাবে মহান...

এমন কোনো মুসলিম নেই, যার ঘাড়ে এই ব্যক্তির কোনো না কোনো ঋণ নেই।"

লেখক: ফয়সাল আল-যামিল

হ্যাঁ, তিনি ছিলেন দুর্বল-পাতলা (কৃশকায়) দেহের একজন মানুষ, এমনকি তাঁর কোমরের কাপড়টি (ইজার) খসে পড়ার উপক্রম হতো যদি না তিনি তা বারবার শক্ত করে বেঁধে রাখতেন। তাঁর স্বভাবগত কোমলতার কারণেই তিনি তাঁর বাড়ির পাশের গলিতে একটি মসজিদে বসে অত্যন্ত করুণ ও আবেগময় কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মক্কার বাড়িঘরগুলো কাছাকাছি ও ঠাসাঠাসি করে নির্মিত হওয়ায় রাতের শান্ত পরিবেশে তাঁর সেই কণ্ঠস্বর দেয়ালের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। ফলে তাঁর তিলাওয়াতের আওয়াজ শ্রোতাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করত, যখন তিনি মহান স্রষ্টার মহিমাম্বিত বাণী পাঠ করতেন:

"হে আমার সম্প্রদায়! আমার কী হলো যে, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে ডাকছি, আর তোমরা আমাকে আগুনের দিকে ডাকছ? তোমরা আমাকে অনুরোধ করছ যেন আমি আল্লাহর সাথে কুফরি করি এবং তাঁর সাথে এমন কিছুকে শরিক করি যার কোনো জ্ঞান আমার নেই; অথচ আমি তোমাদেরকে ডাকছি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীলের দিকে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকছ, ইহকাল ও পরকালে তার ডাকার কোনো যোগ্যতা নেই। আর আমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে, এবং সীমালঙ্ঘনকারীরাই তো আগুনের অধিবাসী।" (সূরা গাফির: ৪১-৪৩)

তাঁর কণ্ঠস্বরের মাঝে এমন এক বৈরাগ্য ও দুনিয়াবিমুখতার সুর ছিল, যা শুনলে মনে হতো তিনি যেন কবর থেকে জীবিত হয়ে দুনিয়ার মানুষের সাথে কথা

বলছেন-এমন কিছু কথা যা এইমাত্র আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মেঘের আর্দ্রতা ও সতেজতা যেন এখনও তাতে লেগে রয়েছে। সেই বিষাদময় কণ্ঠের অধিকারীর তিলাওয়াত এক অপূর্ব গুঞ্জে নতুন নতুন অর্থ ও মর্মবাণী কান অঙ্গি পৌঁছে দিত; এমন সব গভীর ভাবার্থ যা মক্কার মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তলকে স্পর্শ করত। ফলে মক্কার পুরুষ ও যুবকেরা আবু বকর ^{রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু}-এর বাড়ির চারপাশের গলিতে ভিড় জমাত।

যখন কুরাইশদের মজলিসগুলোতে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল, তখন তারা মুহাম্মদ ^{সাদ্বাহু আল্লাহি ওয়াসাল্লাম} এর কাছে এই বার্তা পাঠাল:

"হে মুহাম্মদ, আপনার সঙ্গীকে বলুন তিনি যেন তাঁর নিজের ঘরের ভেতরে সালাত আদায় করেন। কারণ তিনি তো আমাদের দাস ও যুবকদের নষ্ট করে দিচ্ছেন।"

কুরাইশরা মূলত তাদের সেইসব দাসদের কথা বলছিল, যাদের প্রাণ মুক্তির এক নীরব আহ্বানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, যা খুব নিঃশব্দে তাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। এই বাণী তাদের জানিয়েছিল যে তারাও মানুষ, তাদেরও নিজস্ব সত্তা ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আর এই কারণেই আবু বকর ^{রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু} ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজের অর্থ দিয়ে দাসদের কিনে স্বাধীন করে দিতেন, যাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিটি ছিলেন বিলাল ^{রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু}।

নবী ^{সাদ্বাহু আল্লাহি ওয়াসাল্লাম}-এর ওফাতের পর সবচেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আবু বকর সিদ্দিক ^{রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু}-এর এই শারীরিক দুর্বলতা এবং স্বভাবগত কোমলতা হঠাৎ করেই যেন উধাও হয়ে গেল। সেদিন সমগ্র আরব উপদ্বীপ এক মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল এবং মানুষের মাঝে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। আরবের গোত্রগুলো মদীনা আক্রমণ করার জন্য এবং একযোগে আঘাত হানার জন্য সমবেত হচ্ছিল। মদীনার পথঘাটে মানুষের মুখে একটাই আলোচনা ছিল, "এখন আমরা কী করব?"

ঠিক তখনই তারা শুনতে পেল যে, রোমানদের মোকাবিলা করার জন্য নবী ^{সাদ্বাহু আল্লাহি ওয়াসাল্লাম} যে বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন, তারা তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে মদীনার বাইরে শিবির স্থাপন করেছে। উসামা বিন জায়েদের নেতৃত্বে এই বাহিনীটি অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, যাতে তারা বর্তমান জর্ডানের 'মাআন' অঞ্চলে ইসলাম

গ্রহণকারীদের হত্যাকারীদের উপযুক্ত জবাব দিতে পারে। এমতাবস্থায়, এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তেও আবু বকর ^{রাঃ} কর্তৃক এই অভিযান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তে মানুষ চরম বিস্ময় প্রকাশ করেছিল।

মানুষের বিস্ময় ছিল আকাশচুম্বী; কারণ মদীনা মুনাওয়ারাহ নিজেই তখন বিভিন্ন গোত্রের তীব্র ও বিধ্বংসী আক্রমণের মুখে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। সবাই ভাবছিল, এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে এই বাহিনীকে হাতছাড়া করা যায়? কিন্তু দূরদর্শী নেতা আবু বকর ^{রাঃ}-এর জবাব ছিল স্পষ্ট:

"রাসূলুল্লাহ ^{সাঃ}-এর আদেশ বাস্তবায়ন করার চেয়ে অন্য কোনো কাজ দিয়ে আমার খেলাফত শুরু হতে পারে না। এমনকি পাখি যদি আমাকে খুবলে ছিঁড়েও নিয়ে যায়, তবুও তা আমার কাছে এর চেয়ে বেশি প্রিয় (তবুও আমি এই আদেশ অমান্য করব না)।"

আবু বকর ^{রাঃ} ছিলেন একজন অনুগত সৈনিকের মতো, যিনি নবী ^{সাঃ}-এর দেওয়া নির্দেশনাবলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন—এমনকি যখন নবীজি মৃত্যুর শয্যায় শায়িত ছিলেন এবং বলেছিলেন: "উসামার বাহিনীকে রওয়ানা করো।"

যখন উসামা ^{রাঃ} বিদায় নেওয়ার জন্য নবীজির কাছে এলেন, তখন নবীজি তাঁর পবিত্র হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং এরপর হাতটি উসামার বুকের ওপর রাখলেন।

উসামার বাহিনী বিশ দিন পর্যন্ত মার্চ (অভিযান) পরিচালনা করল এবং যারা মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের হত্যা করল এবং তাদের কৃতকর্মের প্রতিশোধস্বরূপ তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিল। এরপর কোনো সৈন্য না হারিয়েই বাহিনীটি বিজয়ের খবর সাথে নিয়ে মদীনায় ফিরে এলো। তখন হিমসে অবস্থানরত রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর মিত্রদের এই চরম পরাজয়ের খবর শুনতে পান।

এই বিজয়ের সংবাদ সমগ্র আরব উপদ্বীপে বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে আরবরা বুঝতে পারল যে, যে রাষ্ট্রটি এই আকস্মিক ও শক্তিশালী আক্রমণ

পরিচালনা করতে পারে, সেটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসংহত। এভাবেই প্রমাণিত হলো যে, নবী ^{সাদ্বাহু} ^{আলাহি} ^{ওয়াদ্দাম} যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা কতখানি নির্ভুল ছিল এবং তাঁর খলিফা সিদ্দিক ^{সাদ্বাহু} ^{আলাহি} ^{ওয়াদ্দাম} তা হুবহু বাস্তবায়ন করে দ্বীনত্যাগীদের (মুরতাদদের) বিরুদ্ধে একই দৃঢ় সংকল্প ও বীরত্বের সাথে তাঁর ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা করেছিলেন।

আবু বকর আস-সিদ্দীক-এর খিলাফতের মেয়াদ ছিল দুই বছর, তিন মাস, আট দিন। এর মধ্যে আমরা দুটি প্রধান ঘটনার ওপর আলোকপাত করব: ইনশা আল্লাহ

১। রিদ্দার যুদ্ধ (স্বধর্মত্যাগীদের যুদ্ধ) সংক্রান্ত তাঁর অবস্থান

২। সাকীফাহ বনী সাইদাহর ঘটনা

আমরা কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করিনি, কারণ সাকীফার ঘটনাটি আগে ঘটেছিল। প্রথমে এর প্রভাবের পরিধি তুলে ধরার জন্য এটি করা হয়েছে, তারপর এই স্মারকপত্রের দ্বিতীয় অংশে সাকীফার নিচে কী ঘটেছিল তার বিস্তারিত বিবরণে আমরা ফিরে যাব।

প্রথমত: রিদ্দার যুদ্ধ (৪টি পর্যায়ে)

(১) রিদ্দা বা মুরতাদ হওয়ার প্রতি তাঁর অবস্থান ছিল শেষ রিসালতের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন:

আল-আসওয়াদ আল-আনসি ইয়েমেনে নবুওয়াতের দাবি করে এবং তার সাথে মাজহিজ গোত্র মুরতাদ হয়ে যায়। তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ নবুওয়াতের দাবি করে এবং বনু আসাদ, গাতফান, তাই ও গাউস গোত্র তার অনুসরণ করে। সাজাহ নবুওয়াতের দাবি করে এবং বনু তাগলিব তার সাথে যোগ দেয় এবং বনু তামিম তাকে সমর্থন করে। মুসাইলামা আল-কাযযাব ইয়ামামায় নবুওয়াতের দাবি করে এবং বনু হানিফা তার অনুসরণ করে এবং সে তাদের সালাত মওকুফ করে দেয়। একইভাবে ওমানে লাকীত বিন মালিক আল-আযদী নবুওয়াতের দাবি করে।

আর এই মুরতাদরা মদিনা মুনাওয়ারায় একটি প্রতিনিধি দল পাঠাল রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাহু} ^{আলাহি} ^{ওয়াদ্দাম}-এর খলিফার সাথে ইসলামের কিছু রুকন বা স্তম্ভ, বিশেষ করে যাকাত মওকুফ করার বিষয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং

তাঁর সেই বিখ্যাত বাণীটি উচ্চারণ করলেন: "আল্লাহর কসম, তারা যদি আমাকে একটি উটের রশিও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাদ্বাহ্} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম}-এর কাছে প্রদান করত, তবে আমি তার জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব।"

তখন ওমর বিন আল-খাত্তাব ^{রাদিয়াল্লাহু} ^{তা'আলা} ^{আনহু} তাঁকে বললেন: "আপনি কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন যখন রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাদ্বাহ্} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} বলেছেন: 'আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যতক্ষণ না তারা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অতএব, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সে আমার থেকে তার জান ও মাল নিরাপদ করে নিল, তবে ইসলামের হক বা অধিকার ব্যতীত, আর তার হিসাব আল্লাহর ওপর।'" তখন তিনি উত্তর দিলেন: "আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কারণ যাকাত হলো মালের হক।"

আরকানুল ইসলাম

শাহাদাতাইন, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান, রমযানের সিয়াম বাইতুল্লাহর হজ।

সুতরাং, আবু বকরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সামগ্রিক যা এই শেষ রিসালতকে খণ্ডিত করা মেনে নেয়নি (কারণ ইসলাম একটি অবিভাজ্য পূর্ণাঙ্গ রূপ...)। একটি ফরয ও অন্য ফরযের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সাহাবিরা মনে করেছিলেন যে কোমলতা প্রদর্শন করাই উত্তম হবে এবং ওমর তাঁকে বলেছিলেন: "হে রাসূলুল্লাহর খলিফা! মানুষের মন জয় করুন এবং তাদের প্রতি কোমল হোন।" আবু বকর তাঁকে উত্তর দিলেন: "আমি তোমার সাহায্যের আশা করেছিলাম, আর তুমি আমার কাছে এসেছ নিরাশ করতে? জাহেলিয়াতের যুগে তুমি ছিলে অত্যন্ত কঠোর, আর ইসলামের যুগে এসে ভীর্ণ হয়ে গেলে? ওহী বন্ধ হয়ে গেছে এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, আর আমি জীবিত থাকা অবস্থায় কি তা হ্রাস পাবে? রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাদ্বাহ্} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} কি বলেননি: 'তবে তার হক বা অধিকার ব্যতীত'? আর সালাত ও যাকাত আদায় করা তো তার হকেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কসম, যদি সমস্ত মানুষও আমাকে ছেড়ে চলে যায়, তবুও আমি একাকী আমার জান দিয়ে এর জন্য জিহাদ করব।"

(২) যদি ধর্মত্যাগীরা (মুরতাদরা) সফল হতো, তবে ইসলামের কোনো অস্তিত্ব থাকত না:

কোমল স্বভাব ও হালকা-পাতলা শরীরের একজন মানুষের এই দৃঢ় অবস্থান দ্বীন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল সেভাবেই তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছিলেন। আর যদি সেই অবস্থান না থাকত:

◆ দ্বীনের রুকনগুলো একে একে ভেঙে পড়ত; কারণ মুসাইলামা মানুষের সালাত মওকুফ করে দিয়েছিল এবং এর পরে যাকাতও বাদ পড়ে যেত। আমরা সেই প্রজন্মের কাছ থেকে এমন এক অদ্ভুত দ্বীন পেতাম যার সাথে আজকে আমরা যা জানি তার কোনো সম্পর্ক থাকত না—এমন এক দ্বীন যা সম্পূর্ণ অস্পষ্টতা, আকীদাগত বিশৃঙ্খলা এবং ন্যায়বিচার ও মূল্যবোধের পরিবর্তনশীল মানদণ্ডে ভরা থাকত, এমন এক সময়ে যা শ্রেণীভেদ এবং গোত্রীয় মেরুকরণের যুগের খুব কাছাকাছি ছিল।

◆ দ্বীনটি সম্পূর্ণ আঞ্চলিকতায় রূপ নিত; যা ইয়েমেনের জন্য উপযুক্ত তা ওমানের প্রয়োগের চেয়ে আলাদা হতো, এবং এভাবেই চলত। এটি এমন এক দ্বীন হতো যার নিয়মাবলী মানুষ তাদের স্থানীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী তৈরি করত, যা বিশ্বের বাকি অংশে গ্রহণ করা কঠিন রহস্যে পরিণত হতে বেশি সময় নিত না; ঠিক যেমনটি ঘটেছিল মঙ্গোল আক্রমণকারীদের ধর্মের ক্ষেত্রে যারা পৃথিবীতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল যাতে পুরো বিশ্ব তাদের একটি রাজ্যে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে, ইসলাম এমন এক দ্বীন যা মানব প্রকৃতি (ফিতরাত) ও সুস্থ বিবেকের সাথে কথা বলে, আর এ কারণেই মানবজাতি তাদের বৈচিত্র্যময় অবস্থা ও সংস্কৃতি সত্ত্বেও একে গ্রহণ করেছে।

◆ যদি সেই অবস্থান না থাকত, তবে ইসলামের পরিধি মদিনা মুনাওয়ারা ও মক্কার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত এবং এটি এত দ্রুত এবং এত দৃঢ়ভাবে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ত না যেখানে এটি পৌঁছেছে। আর এর কারণ ছিল সেই হালকা-পাতলা শরীরের মানুষের দৃঢ় অবস্থান।

যখন রিদদার যুদ্ধ সুস্পষ্ট বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হলো, ওমর ব রাসূলুল্লাহ <sup>সাদ্বাহাছ
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম</sup>-এর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং সরাসরি মজলিসের সামনে আবু বকরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সমস্ত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর দীর্ঘ অবয়ব নিয়ে ঝুঁকে আবু বকরের মাথায় চুম্বন করলেন এবং বললেন: "আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা, আপনি না থাকলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম।"...

♦ হ্যাঁ, উসামার সেনাবাহিনীর যাত্রার মাধ্যমে মদিনা তার নিজ ভূখণ্ডে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং মুরতাদদের দাবি প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতির জন্য ইসলামকে যেভাবে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল সেভাবে পূর্ণাঙ্গ ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রক্ষা করেছিলেন। ফলে সালাত ও যাকাতের বিধানের জ্ঞান প্রচার অব্যাহত রইল। তা না হলে আমরা নবী <sup>সাদ্বাহাছ
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম</sup>-এর এই হাদীসটিও শুনতে পেতাম না যেখানে তিনি বলেছেন: তোমরা কী মনে করো, যদি তোমাদের কারও দরজায় একটি নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে? তারা বলল: "কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।" তিনি বললেন: অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।" মুসাইলামা ও সাজাহর দ্বীনে আমরা এমন হাদীস শুনতে পেতাম না। এমনকি উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের সঠিক ধারণাও বিলীন হয়ে যেত। মানুষ জিজ্ঞেস করেছিল: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের রব কি কাছে আছেন যে আমরা তাঁর সাথে চুপিচুপি কথা বলব, নাকি দূরে আছেন যে আমরা তাঁকে চিৎকার করে ডাকব?" তখন আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়: (আর যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন বলো- যে আমি নিশ্চয়ই নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিই যখন সে আমাকে আহ্বান করে)। আর যখন নবী <sup>সাদ্বাহাছ
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম</sup> সফরে তাদের উচ্চস্বরে চিৎকার করে আল্লাহর কাছে দুআ করতে দেখলেন, তখন বললেন: হে মানুষ! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও, কারণ তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না, তোমরা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা সত্তাকে ডাকছ। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের নিয়ে আসা হেদায়েতের সমস্ত

আলোকবর্তিকা তাদের গুরুত্ব লগ্নেই ধ্বংস হয়ে যেত যদি না আবু বকর আস-সিদ্দীক ^{রাঃ} ইতিহাসের পাতায় এই গভীর মর্যাদাপূর্ণ আকীদাগত অবস্থানটি তৈরি করতেন ।

(৩) সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা শর্ত নয়:

রিদ্বার ঘটনা থেকে বড় শিক্ষা হলো আবু বকর সংখ্যাগরিষ্ঠতার মতামতের ওপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেননি । এর মাধ্যমেই এটি স্পষ্ট হয় যে, শাসকের কাছে যদি অন্য কোনো মতামত অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়, তবে শুরা বা পরামর্শ শাসকের জন্য বাধ্যতামূলক নয় । শুরা হলো মতামতের সমৃদ্ধি ও সংশোধন এবং সঠিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একটি যৌথ প্রচেষ্টা । পরিশেষে: (আর কাজের ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করো, অতঃপর যখন তুমি সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো । নিশ্চয়ই আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন) (সূরা আল-ইমরান: ১৫) । শুরা স্বয়ং একটি ওয়াজিব বিষয় ("যে ইস্তিখারা করেছে সে ব্যর্থ হয়নি এবং যে পরামর্শ করেছে সে অনুতপ্ত হয়নি") । এর উদাহরণ ইয়েমেনের রানীর পরামর্শের মধ্যেও পাওয়া যায়: (সে বলল, হে পরিষদবর্গ! আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও । তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না ।) (সূরা আন-নামল: ৩২) । আর তাদের পরামর্শ ছিল যুদ্ধের পক্ষে: (তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, আর সিদ্ধান্ত আপনারই হাতে, অতএব ভেবে দেখুন আপনি কী আদেশ দেবেন) (সূরা আন-নামল: ৩৩) । কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত তাদের মতামতের চেয়ে আলাদা ছিল: (সে বলল, রাজাবাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তা বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাপূর্ণ অধিবাসীদের অপদস্থ করে, আর তারাও এরূপই করবে । আর আমি তাদের কাছে একটি উপহার পাঠাচ্ছি, অতঃপর দেখি দূতেরা কী নিয়ে ফিরে আসে) (সূরা আন-নামল: ৩৪-৩৫) ।

অতএব, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব এবং তিনি শুরার দ্বারা আবদ্ধ নন । আর এটাই সেই ভিত্তি যার ওপর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । আধুনিক যুগে এই শব্দগুলো ফরাসি রাজনৈতিক চিন্তাবিদ মন্টেস্কু দ্বারা তৈরি করা

হয়েছিল এবং প্রাচীন রোমানরা এটি কার্যকর করেছিল, যেখানে ক্ষমতার শাখাগুলোকে নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হলেও এবং নির্বাহী বিভাগের প্রয়োগ বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার মধ্যে ভিন্ন হলেও, ইসলামে শুরার মডেলটি হলো এটি এই প্রয়োগ অনুযায়ী দিকনির্দেশনামূলক, যার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কারণ, রাষ্ট্রপ্রধানের পরামর্শের পর তাঁর ক্ষমতা চর্চা না করার কোনো অর্থ হয় না, আর আবু বকর ^{রাঃ} ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরোধিতা তাঁকে এ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

(৪) রিদ্দার যুদ্ধের কৌশলগত মাত্রা হলো ‘আরব উপদ্বীপের ঐক্য’:

কৌশলগত দূরদর্শী স্তরে, আবু বকর ^{রাঃ} তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরি উমর ^{রাঃ} -এর জন্য একটি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ আরব ভূখণ্ড রেখে গিয়েছিলেন। এই ঐক্য যদি সেদিন প্রতিষ্ঠিত না হতো, তবে ইসলাম কখনো খিলাফতের সীমানা পেরিয়ে পশ্চিমে, পূর্বে এবং উত্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারত না।

এই ঐক্য ছাড়া ওমরের যুগে আমরা যে ইসলামী ইতিহাস জেনেছি তা এত বিশাল আকারে এবং এত দ্রুত বাস্তবায়িত হতো না। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন: "ওমরের যুগে ইসলাম প্রতিদিন ২৫০ কিলোমিটার গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছিল।" আবু বকরের যুগটি ছিল মূলত ওমরের যুগের অর্জনের সুদৃঢ় ভিত্তি। এটি এমন একটি বিষয় যা ওমর প্রকাশ্যেই স্বীকার করতেন এবং তিনি বলতেন: "হায়! আমি যদি আবু বকরের বুকের একটি পশম হতাম"—ইসলামী রাষ্ট্রের এই বিশাল ইমারত নির্মাণে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি গভীর মূল্যায়নের কারণে। আল্লাহ সিদ্দীক ও ফারুকের ওপর পূর্ণ সন্তুষ্টি হোন এবং তাঁদের প্রতি রইল উপযুক্ত সম্মান।

খলিফা আবু বকর আস-সিদ্দিকের অ্যাটলাস-হাদিকাতুল মউত (মৃত্যুর বাগান), যেখানে মুসাইলামার বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র যুদ্ধ হয়েছিল

আসুন আমরা আবার এই মানুষের অবস্থান ও বাণীর দিকে ফিরে যাই যা তাঁর ব্যক্তিত্বের সুশৃঙ্খল "সৈনিকত্ব" প্রকাশ করে, যা দুনিয়ার বিষয়ে কোমলতা ও দয়ার

পাশাপাশি আকীদার বিষয়ে কঠোর দৃঢ়তার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিল, আর এটাই হলো মুস্তফা ^{সাদ্বাদ্বাহু}আলাইহি ^{ওয়াসাল্লাম}-এর পথ:

♦ হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়, কুরাইশদের সাথে রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাদ্বাহু}আলাইহি ^{ওয়াসাল্লাম}-এর চুক্তিটি এমন ছিল যে-মুসলিমরা সে বছর উমরাহ না করেই মদীনায় ফিরে যাবে। এই শর্তটি মেনে নেওয়া মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন হযরত উমর ^{রাদিয়াল্লাহু}তা'য়ালা ^{আনহু}। আবু বকর ^{রাদিয়াল্লাহু}তা'য়ালা ^{আনহু} যখন দেখলেন উমর অত্যন্ত আবেগের সাথে রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাদ্বাহু}আলাইহি ^{ওয়াসাল্লাম}-এর কাছে বারবার এই সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা চাইছেন, তখন তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও গম্ভীরভাবে উমরকে বললেন: “হে উমর! তিনি আল্লাহর রাসূল। অতএব, এবার থামুন।” এর অর্থ ছিল-যেকোনো পরিস্থিতিতে রাসূলের পদক্ষেপকে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁর সীমানা লঙ্ঘন করা যাবে না। এটাই ছিল সেই সৈনিকত্ব যা আবু বকর ^{রাদিয়াল্লাহু}তা'য়ালা ^{আনহু} বুঝতে পেরেছিলেন।

অন্য এক সফরে, উসামা ^{রাদিয়াল্লাহু}তা'য়ালা ^{আনহু} ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি ছিলেন বাহিনীর প্রধান, আর খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর ^{রাদিয়াল্লাহু}তা'য়ালা ^{আনহু} তাঁর পাশে পায়ে হেঁটে চলছিলেন। উসামা যখন খলীফার সম্মানে নিচে নেমে হেঁটে চলতে চাইলেন, তখন আবু বকর তাঁকে বললেন: “তুমি নিচে নামবে না। আল্লাহর পথে আমার পা দুটি যদি কিছুক্ষণের জন্য ধূলিমলিন হয়, তবে তাতে ক্ষতি কী!” অতঃপর নিম্নের কথা দিয়ে অসিয়ত করলেন:

বিশ্বাস রাখ, মৃত্যুর প্রতি এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই তোমাকে অমর ও চিরন্তন জীবন দান করবে!

আল্লাহ ^{সুব্বানাহু}ও ^{ওয়াতা'লা}এই মহান ব্যক্তির ওপর তাঁর অসীম রহমত বর্ষণ করুন।

আল্লাহ আবু বকর আস-সিদ্দিকের প্রতি রহম করুন, যিনি অবয়বে ছিলেন দুর্বল, কিন্তু কাজে ও আচরণে ছিলেন এক পরাক্রমশালী সিংহ। আল্লাহ তাঁকে মুহাম্মাদের উম্মতের পক্ষ থেকে উত্তম জাযা খায়ের দান করুন।

দ্বিতীয়ত: সাকিফাহ বনি সায়েদাহ (ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছিল)

মহানবী ^{সাদ্বাদ্বাহু}আলাইহি ^{ওয়াসাদ্বাহু}১১ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার ইন্তেকাল করেন। আর এটিই ছিল তাঁর জন্মের দিন, অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল। এই ঘটনায় মানুষ তীব্রভাবে স্তম্ভিত ও শোকাহত হয়ে পড়ে এবং পুরো মদীনাজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। যেহেতু তাঁর ঘরটি মসজিদের সাথেই লাগোয়া ছিল, তাই ঘরে থাকা মানুষের কান্নাকাটি এবং মসজিদের ভেতরে থাকা মানুষের ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দের মাঝে কোনো আড়াল ছিল না।

হযরত উমর ^{রাদিয়াল্লাহু}তা'য়ালা ^{আনহু}-এর আবেগ ও উত্তেজনা প্রকাশ্য রূপ নিয়েছিল এবং তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন: "যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মদ মারা গেছেন, আমি তার ঘাড় উড়িয়ে দেব! বরং তিনি তাঁর রবের সাথে সাক্ষাত করতে গেছেন, যেভাবে মূসা (আ.) গিয়েছিলেন; এবং তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন।"

হযরত আলী ^{রাদিয়াল্লাহু}তা'য়ালা ^{আনহু} তাঁর জীবনের শেষভাগে এসে বলেছিলেন: "আল্লাহর কসম, আমি আমার জীবনে মাত্র দুবার নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম; প্রথমবার আল্লাহর রাসূল ^{সাদ্বাদ্বাহু}আলাইহি ^{ওয়াসাদ্বাহু}-এর ইন্তেকালের দিন, আর দ্বিতীয়বার উসমান ^{রাদিয়াল্লাহু}তা'য়ালা ^{আনহু}-এর হত্যাকাণ্ডের দিন।"

এই তীব্র শোক ও মানুষের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার মধ্যেই, খায়রাজ গোত্রের অন্যতম প্রধান নেতা সাদ বিন উবাদাহ ^{রাদিয়াল্লাহু}তা'য়ালা ^{আনহু} মানুষকে একটি পরামর্শমূলক সভায় বসার আহ্বান জানান। সভাটি খায়রাজ গোত্রের ঘরবাড়িগুলোর মাঝখানে অবস্থিত একটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এলাকাটি ছিল খেঁজুর গাছ এবং ফসলি জমিতে ঘেরা, যা পুরো মদিনার ওপর তার ছায়া বিস্তার করে রাখত। সেই বাসস্থানগুলোর ঠিক মাঝখানে একটি বড় আঙিনা ছিল, যার ওপর রোদের তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য একটি ছাউনি বা ছাদ (সাকীফাহ) দেওয়া ছিল।

নবীজী ^{সাদ্বাদ্বাহু}আলাইহি ^{ওয়াসাদ্বাহু}-এর ইন্তেকালের পর কী করণীয় বা কী ঘটতে যাচ্ছে, তা আনসারদের বুঝিয়ে বলার জন্য সাদ বিন উবাদাহ ^{রাদিয়াল্লাহু}তা'য়ালা ^{আনহু} সেই ছাউনির নিচে বসেন। সেখানে তিনি ইসলাম প্রচার ও সুরক্ষায় আনসারদের ভূমিকা এবং কুরাইশদের পক্ষ থেকে পাওয়া অবহেলার বিপরীতে আনসারদের ত্যাগের প্রশংসা করেন, এবং বলেন যে আনসাররাই আল্লাহর রাসূল ^{সাদ্বাদ্বাহু}আলাইহি ^{ওয়াসাদ্বাহু}-এর সাথে যে অঙ্গীকার

করেছিলেন তা পূরণ করেছেন। আর এখন যেহেতু তিনি তাঁর রবের সান্নিধ্যে চলে গেছেন, তাই মদিনাবাসীদের (আনসারদের) নিজেদের যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করার এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামি দাওয়াতের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্বের অবস্থান পুনরায় ফিরে পাওয়ার সময় এসেছে।

অসুস্থতার কারণে তিনি (সাদ বিন উবাদাহ) খুব নিচু কণ্ঠে কথা বলছিলেন এবং তাঁর মাথায় একটি কাপড়ের পটি বাঁধা ছিল। তাই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পুত্র কায়েস তাঁর কথাগুলো উচ্চস্বরে পুনরুক্তি করছিলেন, যাতে উপস্থিত সকলে তা শুনতে পায়।

ঠিক সে মুহূর্তে... এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে ছুটে গেলেন এবং সেখানে কী ঘটছে সে সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে বললেন: "আনসারদের এই দল সাকীফাহ বনী সায়েদাহ-তে সাদ বিন উবাদাহর পক্ষে একতাবদ্ধ হয়েছে। শাসনভার বা জনগণের বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো করণীয় বা প্রয়োজন থেকে থাকে, তবে বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করার আগেই দ্রুত সেখানে গিয়ে পৌঁছান।"

এ কথা শুনে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর ^{রাঃ} তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং সাকীফাহ বনী সায়েদাহ-র দিকে রওনা হলেন। তাঁরা যখন সেখানে প্রবেশ করলেন, তখন উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তাঁদের দিকে নিবদ্ধ হলো।

সে সময় সাদ বিন উবাদাহ ^{রাঃ} ব্যথার তীব্রতায় গায়ে চাদর জড়িয়ে শুয়ে ছিলেন, আর তাঁর গোত্রের মুখপাত্র উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে বলছিলেন: "আমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী (আনসার) এবং ইসলামের অতন্দ্র বাহিনী। আর হে মুহাজির সম্প্রদায়! তোমরা হলে আমাদের নবীর স্বগোত্রীয়। অথচ এখন তোমাদের মধ্য থেকে ছোট একটি দল আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে, যারা চায় আমাদেরকে আমাদের মূল অবস্থান ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয় (নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব) থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

সুতরাং, দৃশ্যপটটি এখন স্পষ্ট যে-আনসারগণ, অথবা (বিশেষ করে খায়রাজ গোত্র)-মদিনার ওপর তাদের নেতৃত্ব এবং দিন দিন সীমানা প্রসারিত হতে থাকা এই রাষ্ট্রের শাসনভার নিজেদের হাতে নেওয়ার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন।

কোনো দীর্ঘ আলোচনা বা বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে, হযরত আবু বকর ^{রাঃ} সরাসরি কথা বলতে শুরু করেন। তিনি এমন কোনো বিষয়ই বাদ রাখেননি যা মহান আল্লাহ ^{সুবহানাহু ওয়াতালী} এবং তাঁর রাসূল ^{সাদ্বাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আনসারদের মর্যাদায় অবতীর্ণ বা বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সবটুকুই সেখানে স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁদের প্রশংসায় রাসূল ^{সাদ্বাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যা বলেছিলেন, তিনি তা তুলে ধরেন: "মানুষ যদি কোনো এক উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসাররা অন্য উপত্যকা দিয়ে চলে, তবে আমি আনসারদের উপত্যকা দিয়েই চলব। মানুষ হলো বহির্বাস (সাধারণ পোশাক) আর তোমরা (আনসাররা) হলে অন্তর্বাস (শরীরের সবচেয়ে কাছের বিশেষ পোশাক)।"

এরপর আবু বকর ^{রাঃ} সরাসরি সভার আহ্বানকারী সাদ (বিন উবাদাহ)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন: "হে সাদ! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আপনি বসা থাকা অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ^{সাদ্বাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছিলেন-'কুরাইশরাই হলো এই শাসন ক্ষমতার অধিকারী; মানুষের মধ্যে যারা সৎ তারা কুরাইশদের সৎ লোকদের অনুগামী হবে, আর যারা অসৎ তারা কুরাইশদের অসৎ লোকদের অনুগামী হবে'।"

এ কথা শুনে সাদ ^{রাঃ} বললেন: "আপনি সত্য বলেছেন, আমরা হব উজির (সহযোগী বা মন্ত্রী) আর আপনারা হবেন আমির (নেতা বা শাসক)।"

এখানে মহানবী ^{সাদ্বাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কর্তৃক কুরাইশদের নাম উল্লেখ করার প্রধান কারণ ছিল-সমগ্র আরবের ঐক্য। কারণ আরব উপদ্বীপের সবাই কুরাইশদের 'হারাম শরিফ' বা কাবা গৃহের রক্ষক হিসেবে সম্মান করত এবং সবাই হজের উদ্দেশ্যে সেখানে যেত। তাদের এই বিশেষ অবস্থানের কারণে কোনো গোত্রের সাথেই তাদের রক্তক্ষয়ী শত্রুতা বা গোত্রীয় প্রতিশোধের দ্বন্দ্ব ছিল না। আরবদের সমস্ত ব্যবসায়ী কাফেলা নিরাপদে তাদের অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করত এবং কোনো গোত্রই তাদের পথরোধ করত না।

আবু বকর ^{রাঃ} তাঁর বক্তব্যের শেষভাগে বললেন: "এই যে ওমর ইবনুল খাত্তাব উপস্থিত আছেন-যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ব বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! ওমরের মাধ্যমে এই দ্বীনকে সম্মানিত করুন'; এবং এই যে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ উপস্থিত আছেন-যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ব বলেছিলেন, 'তিনি এই উম্মতের বিশ্বস্ত

ব্যক্তি (আমীন)' । আপনারা এই দুজনের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বায়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করুন ।"

তখন তাঁরা দুজনে (ওমর ও আবু উবাইদাহ) বলে উঠলেন: "আল্লাহর কসম! আমরা কোনোভাবেই আপনার চেয়ে এগিয়ে যেতে পারি না (অর্থাৎ আপনার আগে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারি না) ।"

সাকীফাহর নিচে যখন এভাবে আলোচনা-তর্ক চলতেই থাকল, হুটগোল বেড়ে গেল এবং কণ্ঠস্বর চড়া হতে লাগল, তখন উপস্থিত বিচক্ষণ ব্যক্তির আশঙ্কা করলেন যে দ্বন্দ্ব হয়তো আরও বড় আকার ধারণ করতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে হযরত ওমর ^{রাঃ} বললেন: "হে মুসলিম সম্প্রদায়! আল্লাহর রাসূলের পর এই শাসনভারের জন্য সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি যোগ্য, যিনি ছিলেন—'দুজনার দ্বিতীয়জন, যখন তাঁরা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন' (অর্থাৎ আবু বকর ^{রাঃ}) ।"

এই বলে ওমর ^{রাঃ} যখন আবু বকর ^{রাঃ} -এর হাতে বায়াত গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন, ঠিক তখনই আনসারদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি—যিনি হলেন বশীর বিন সাদ (নোমান বিন বশীরের পিতা)—তিনি এগিয়ে গিয়ে ওমরের আগেই আবু বকরের হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন । এরপর ওমর ^{রাঃ} বায়াত হলেন এবং উপস্থিত অন্যান্য মানুষও একে একে তাঁদের অনুসরণ করে বায়াত গ্রহণ করলেন ।

বায়াত সম্পন্ন হওয়ার পর, হযরত আবু বকর ^{রাঃ} ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন । তিনি প্রথমে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করলেন, তারপর বললেন: "হে মানবসকল! আমাকে আপনাদের ওপর শাসনভার অর্পণ করা হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের চেয়ে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই । যদি আমি ভালো কাজ করি, তবে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন; আর যদি আমি ভুল বা অন্যায় পথ অবলম্বন করি, তবে আপনারা আমাকে সংশোধন করে দেবেন । সত্য হলো আমানত এবং মিথ্যা হলো খেয়ানত ।

আপনাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তিটি আমার কাছে শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি (আল্লাহর ইচ্ছায়) তার পাওনা বা অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি । আর আপনাদের

মধ্যকার শক্তিশালী ব্যক্তিটি আমার কাছে দুর্বল, যতক্ষণ না আমি (আল্লাহর ইচ্ছায়) তার কাছ থেকে হকের পাওনা আদায় করে নিচ্ছি।

যে জাতিই আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। আর যে জাতির মাঝে অনাচার বা অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তাদের ওপর মহামারি বা বিপর্যয় অবতীর্ণ করেন।

আপনারা ততদিন পর্যন্ত আমার আনুগত্য করুন, যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, তবে আমার প্রতি আপনাদের আনুগত্য করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এবার আপনারা নামাযের জন্য দাঁড়ান, আল্লাহ আপনাদের ওপর দয়া করুন।"

♦ তাঁরা যদি রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাদ্বাহ্} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} -এর ইন্তেকালের মতো এই গুরুতর ও মহাসংকটের মুহূর্তে ব্যস্ত থাকতেন, তবে ঘটনার মোড় সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ঘুরে যেতে পারত। আমরা যদি একটু পেছনের দিকে ফিরে তাকাই-মক্কা বিজয়ের দিনে যখন মদিনার বাহিনী মক্কার প্রধান সড়কগুলো দিয়ে প্রবেশ করছিল, তখন আনসারদের একটি সেনাদলের নেতৃত্বে ছিলেন খায়রাজ গোত্রের সাদ বিন উবাদাহ ^{বাদিয়াল্লাহ্} ^{তা'মালা} ^{আনহু}। তিনি যখন কুরাইশদের অন্যতম দুই নেতা আবু সুফিয়ান ও আব্বাস ^{বাদিয়াল্লাহ্} ^{তা'মালা} ^{আনহু} -এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বিজয়ের উল্লাসে নিজের তরবারি নেড়ে বলে উঠলেন: "আজকের দিনটি হলো মহাযুদ্ধের (রক্তপাতের) দিন, আজ আল্লাহ কুরাইশদের লাঞ্ছিত করবেন।" এ কথা শুনে ওই দুই ব্যক্তি দ্রুত রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাদ্বাহ্} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} -এর কাছে ছুটে গেলেন-যিনি ইতিমধ্যে মক্কাবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন-এবং সাদ বিন উবাদাহ কী বলেছেন তা তাঁকে জানালেন। তখন নবীজী ^{সাদ্বাদ্বাহ্} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} বললেন: "না, বরং আজকের দিনটি হলো পরম দয়া ও ক্ষমার দিন (ইয়াওমুল মারহামাহ)। আজ আল্লাহ কুরাইশদের সম্মানিত করবেন।"

এরপর রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাদ্বাহ্} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} একটি চূড়ান্ত ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সাদ বিন উবাদাহর হাত থেকে সেনাদলের পতাকা কেড়ে নিয়ে তাঁর পুত্র কায়েস বিন সাদের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, যিনি নিজেও সাহাবীদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত

ব্যক্তিত্ব ছিলেন । এই প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলে সাদের মনে কোনো আঘাত বা ক্ষোভ তৈরি হওয়া ছাড়াই পরিস্থিতির একটি চমৎকার ও উপযুক্ত সমাধান হয়ে গেল ।

সুতরাং, আমরা এখানে এমন এক ব্যক্তিত্বকে (সাদ বিন উবাদাহ) দেখতে পাই যিনি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন । আর এই উচ্চাভিলাষের কারণেই তিনি পরবর্তীতে আবু বকর ^{রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু}-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান । এ সময় ওমর ^{রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু} আবু বকর ^{রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু}-কে বললেন: "সাদের কাছে লোক পাঠান যাতে সে বায়াত গ্রহণ করে ।" কিন্তু বশীর বিন সাদ তাঁদের দুজনকে বললেন: "তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দিন । তিনি তো মাত্র একজন মানুষ, যে নিজের ঘরে বসে আছেন ।" ফলে সাদকে তাঁর নিজের অবস্থাতেই ছেড়ে দেওয়া হলো ।

পরবর্তীতে যখন ওমর ^{রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু}-এর খিলাফতের সময় এলো, তখনও সাদ বিন উবাদাহ তাঁর বায়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান । এরপর তিনি সিরিয়ায় (শাম) চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন ।

সারকথা হলো, হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর ^{রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু}-এর সাকীফাহ বনী সায়েদাহ-তে তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নেওয়া ও সেখানে ছুটে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল । এটি খিলাফতের নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ একটি গোত্রীয় বা বংশীয় রূপ ধারণ করা থেকে রক্ষা করেছিল ।

যদি শাসনভার সাদ বিন উবাদাহ আল-খায়রাজির হাতে চলে যেত, তবে আউস গোত্র কখনোই তা মেনে নিত না এবং সাদের পর খিলাফত যেন তাদের হাতে আসে সেই চেষ্টা করত । কারণ এই দুই গোত্রের (আউস ও খায়রাজ) মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, এমনকি প্রাক-ইসলামি যুগে তাদের মধ্যে 'বুআসের যুদ্ধ'-এর মতো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল ।

এমনকি ইসলাম গ্রহণের পরও, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর জীবদ্দশায় একবার এক ইহুদি চক্রান্তকারী তাঁদের মধ্যের সেই পুরনো ক্ষোভকে উস্কে দিতে সক্ষম হয়েছিল । পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়েছিল যে, দুই গোত্রের মানুষ অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধের জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করে ফেলেছিল ।

ঘটনাটি জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাহাজ্জ} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} অত্যন্ত দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে যান। ঘটনার গুরুত্ব ও ভয়াবহতা এত বেশি ছিল যে, তিনি তাড়াহুড়োয় চাদরটি গায়ে জড়াতে জড়াতে ঘর থেকে বের হন। যখন তিনি তাদের জমায়েত হওয়ার স্থানে পৌঁছালেন, তখন বললেন: "হে মুসলিম সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো! আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকা অবস্থাতেই তোমরা জাহেলিয়াতের ডাক দিচ্ছ? আল্লাহ তোমাদের ইসলাম ও শান্তির পথ দেখানোর পর, এর মাধ্যমে তোমাদের সম্মানিত করার পর, তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের ধারাকে ছিন্ন করার পর, কুফর থেকে তোমাদের রক্ষা করার পর এবং তোমাদের অন্তরগুলোকে জুড়ে দেওয়ার পরও কি তোমরা আবার তোমাদের আগের সেই কুফরির যুগে ফিরে যাচ্ছ?"

এ কথা শোনার পর আউস ও খায়রাজ গোত্রের লোকেরা বুঝতে পারল যে, এটি ছিল শয়তানের প্ররোচনা এবং তাদের শত্রুর একটি চক্রান্ত। তখন তারা কেঁদে ফেলল এবং একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাহাজ্জ} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} -এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে যার যার ঘরে ফিরে গেল। হ্যাঁ, এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা নবীজী ^{সাদ্বাহাজ্জ} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} -এর জীবদ্দশাতেই ঘটেছিল; তাই তাঁর ইন্তেকালের পর যদি দুই গোত্রের যেকোনো একটি খিলাফতের নেতৃত্ব পেয়ে যেত, তবে এই দ্বন্দ্ব পুনরায় ফিরে আসার আশঙ্কা আরও অনেক বেশি ছিল।

♦ সাকীফাহ বনি সায়েদাহর এই ঘটনাকে গভীর প্রজ্ঞা ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া মূল্যায়ন করলে সেই মহান সাহাবীগণের প্রতি সুবিচার করা হবে না। সেটি এমন এক যুগ ছিল যার পরপরই ইসলামের ওপর নেমে এসেছিল 'রিদ্দা যুদ্ধ' বা স্বধর্মত্যাগীদের মহাঝড় এবং ভণ্ড নবীদের (ইয়ামামায় মুসাইলিমা কাযযাব, ইয়েমেনে আল-আসওয়াদ আল-আনসি, সাজাহ এবং তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ) উগ্র আত্মপ্রকাশ। এই চরম সংকট কাটিয়ে ইসলামকে নিরাপদ উপকূলে পৌঁছানোর জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। ইসলামের এই তরণ কিস্তি ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রের ভিত মজবুত করতে এই রাজনৈতিক ঐক্য ছিল অপরিহার্য। মদীনার সাহাবীগণের মধ্যে যদি সেদিন নেতৃত্বের এই বিষয়টি

শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান না হয়ে ভিন্ন রূপ নিত, তবে ইসলামের ইতিহাস চিরতরে হারিয়ে যেত। রাসূলের ওফাতের পর সমগ্র আরবে যখন চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তখন কেবল দুটি শহর ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে টিকে ছিল—মক্কা এবং মদীনা। এটিই আমাদের প্রমাণ করে সাকীফার ঘটনাটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাকীফাহ বনি সায়েদাহ ছিল মূলত ইসলামের রক্ষাকবচ এবং একটি মজবুত সেতু, যার ওপর ভর করে ইসলামের এই শাস্বত বাণী আজ আমাদের প্রজন্ম এবং অনাগত প্রজন্মের কাছে সুরক্ষিতভাবে পৌঁছাতে পেরেছে। ইতিহাসের সেই মহাসংকটকালে যারা ইসলামের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁদের ওপর অসীম রহমত বর্ষণ করুন। এবং যারা এর গুরুত্ব অনুধাবনে ভুল করেছেন, আল্লাহ তাঁদেরও ক্ষমা করুন।

মদীনা মুনাওয়ারায় সাকীফাহ বনি সায়েদাহর বর্তমান অবস্থান:

এই ঐতিহাসিক সাকীফা চত্বরটি মসজিদে নববীর উত্তর-পশ্চিম (North-West) কোণে অবস্থিত। এই স্থানটি মূলত বনি সায়েদাহ গোত্রের খায়রাজ শাখার ঘরবাড়ির ঠিক মাঝখানে ছিল। এটি একটি ছোট বাগানের মতো ঘেরা জায়গা ছিল যার চারপাশে তাদের বাড়িগুলো ছড়ানো ছিল এবং খেজুর গাছের ঘন ডালপালা একে ছায়াময় করে রাখত। সাকীফাটি বেশ বড় এবং প্রশস্ত ছিল যার কারণে আনসারদের (সাহায্যকারীদের) একটি বড় দল সেখানে সহজেই বসতে পেরেছিল। সাকীফার ঠিক সামনে একটি বড় ফাঁকা মাঠ ছিল, যাতে সভাকক্ষ পূর্ণ হয়ে গেলে অতিরিক্ত মানুষ সেখানে সমবেত হতে পারে। সাকীফার ঠিক পাশেই বনি সায়েদাহ গোত্রের একটি ঐতিহাসিক পানির কুয়া (বাথান) ছিল। সময়ের আবর্তনে এই সাকীফাটি একটি ভবনে রূপান্তরিত হয় এবং যুগের পর যুগ ধরে এর স্থাপত্যশৈলীতে পরিবর্তন আসে। বর্তমান যুগে, এই ঐতিহাসিক সাকীফার স্থানটিকে একটি সুন্দর পাবলিক পার্কে (উদ্যান) রূপান্তর করা হয়েছে, যা মসজিদে নববীর পশ্চিম দেয়ালের ঠিক পাশেই অবস্থিত।